উচ্চশিক্ষার মান নিয়ে বিতর্ক চলছেই

২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০০:০০
আপডেট: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০০:৩৪

দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকায় ১৩ সেপ্টেম্বর (২০১৯) প্রকাশিত ‘বিশ্বসেরার তালিকায় এবারও হাজারের মধ্যে নেই ঢাবি’ সংবাদটি নিয়ে আগের মতোই তোলপাড় শুরু হয়েছে। কারণ লন্ডনভিত্তিক শিক্ষাবিষয়ক সাময়িকী টাইমস হায়ার এডুকেশন ২০২০ সালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যে র‍্যাংকিং করেছে, সেখানে দেখা গেছেÑ গত চার বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষার মান ক্রমাগত অবনতির দিকেই যাচ্ছে। অথচ ২০২১ সালে ঢাবির শতবর্ষ উদযাপন হতে যাচ্ছে। শতবর্ষ বয়সী এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান নিয়ে এখনো বিতর্কে জড়িত হতে হচ্ছে আমাদের। প্রমাণ করার জন্য আমরা সচেষ্ট যে, এটির মান এখন পর্যন্ত ভালো এবং এ দেশ পরিচালিত হচ্ছে মূলত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের দ্বারা। তবু ভাবনা থেকে যায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের দলাদলি, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ নিয়ে। বিকশিত হওয়ার যথার্থ পরিবেশ না পাওয়া কিংবা অনেক সীমাবদ্ধতার কারণ পর্যালোচনা করতে হয়। একজন শিক্ষার্থীর অর্জন কিংবা গবেষণার সাফল্য কেবল তার নিজের নিরন্তর প্রচেষ্টার মধ্যে আবদ্ধ থাকলে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধার যাথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীকে লালন করে তার অনুসন্ধিৎসু মানসিকতার সার্থক পরিণতিপ্রাপ্তির জন্য। প্রতিষ্ঠান ছাত্রছাত্রীকে নিরাপত্তা দেয়Ñ সুন্দর পরিবেশে বইয়ের পাতা ওল্টানো ও ল্যাবরেটরি ব্যবহার করে নতুন চিন্তার প্রসারণে ভূমিকা রাখে। এ জন্য দরকার হয় সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীÑ যারা দায়িত্ব পালনে নিবেদিত, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কাজ করতে সক্ষম। সব

মিলিয়ে একটি সমন্বিত ব্যবস্থা না থাকলে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান জ্ঞান সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়। ফলে ‘র‌্যাংকিং’ তালিকায় এর অবস্থান হয় নিম্নপর্যায়ে। বিদেশে আমাদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি প্রশ্নের মুখে পড়ে।

advertisement

উল্লেখ্য, দেশের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান ৩৯ লাখ শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যায় বাংলাদেশের স্থান বিশ্বে চতুর্থ। বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম জনবহুল দেশ। পৃথিবীর এক হাজার ভাগের ২৪ ভাগ মানুষ এখানে বাস করে। এই জনবহুল দেশটির কোনো বিশ্ববিদ্যালয় মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে নাÑ এটি আমাদের জন্য লজ্জার বিষয়।

দুই.

মূলত শিক্ষার পরিবেশ, গবেষণার সংখ্যা ও সুনাম, গবেষণার উদ্ধৃতি, এ খাত থেকে আয় এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বা সংশ্লিষ্টতাসহ প্রভৃতি মানদ- বিশ্লেষণ করে চলতি বছর লন্ডনভিত্তিক শিক্ষাবিষয়ক সাময়িকী ‘টাইমস হায়ার এডুকেশন’-এ প্রকাশিত বিশ্বসেরা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকাটিতে ৯২টি দেশের ১ হাজার ৩০০ বিশ্ববিদ্যালয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশের একমাত্র ঢাবির নামই এসেছে। র‌্যাংকিংয়ের মানদ- বিবেচনায় ঢাবির সার্বক্ষণিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৪ হাজার ১০৮ জন। শিক্ষার্থীপিছু কর্মীর সংখ্যা ১৫ দশমিক ৬ এবং নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থীর অনুপাত ৪২ঃ৫৮। বিদেশি শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছে শূন্য। টাইমস হায়ার এডুকেশনের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী ২০১৬ সালে ঢাবিতে শিক্ষার পরিবেশের ক্ষেত্রে ২১ দশমিক ৭ স্কোর করেছিল। কিন্তু ২০১৮ সালে ওই স্কোর কমে হয়েছে ২০ দশমিক ৪। ২০১৯ সালে সেটির সবচেয়ে বড় অবনতি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বর্তমানে এটির স্কোর ১৬। ২০১৬ সালে ঢাবি ছিল এশিয়ার ১৯১তম।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) দায়িত্বে থাকাকালীন এক অনুষ্ঠানে অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেছিলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় গবেষণার জন্য বার্ষিক বরাদ্দ এখন ৬০ কোটি টাকার বেশি। কিন্তু এ অর্থটা সঠিকভাবে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যয় হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় পাঠ্যক্রম যুগোপযোগী করা হয় না এবং সেটি করার প্রয়োজনও বোধ করে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে সব সময় যোগ্যব্যক্তিরা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাচ্ছেন কিনা, সেটি নিয়েও সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বিস্তর অভিযোগ উঠেছে। এসব বাস্তবতার মধ্যে ২০১৯ সালের মে মাসে ওই সাময়িকী এশিয়ার সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি তালিকা প্রকাশ করেছিল। ওই তালিকায় ৪১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বাংলাদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়েরও নাম ছিল না। তালিকার দিকে খেয়াল করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের চেয়ে ভারত ও পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বেশ ভালো করেছে। এই তালিকায় ৩০০ থেকে শুরু করে এক হাজারের মধ্যে রয়েছে ভারতের ৩৬টি বিশ্ববিদ্যালয়। এক হাজারের মধ্যে রয়েছে পাকিস্তানের ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়। মনে রাখতে হবে, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নানা সীমাবদ্ধতা থাকলেও বাংলাদেশের সার্বিক শিক্ষার মান এই অঞ্চলে অন্য দেশগুলোর তুলনায় ভালো। বিশেষত নারী শিক্ষায় এগিয়ে আছে এ দেশ।

যদিও ইউজিসি এক দশক ধরে বাংলাদেশের শিক্ষার মান নির্ধারণ, তদারকিসহ বিশ্ববিদ্যালগুলোয় জবাবদিহি বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছেÑ তবুও সন্তোষজনক ফলপ্রাপ্তি এখনো ঘটেনি। সুষ্ঠু পরিবেশ, অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাবে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে গুণগত শিক্ষা প্রদান ব্যাহত হচ্ছে বলে রিপোর্টও প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগ-পদোন্নতি বিষয়ে ‘অভিন্ন নীতিমালা’ উপস্থাপন থেকে শুরু করে দেশের উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিত করতে ‘অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল অব বাংলাদেশ অ্যাক্ট ২০১৫’ চূড়ান্ত করা হয়েছে। বিশেষত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান, পাঠ্যক্রম, গবেষণা পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন তদারকির জন্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, কানাডাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন করার উদ্যোগ নেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আইনের খসড়া চূড়ান্ত করতেই অনেক সময় কেটে গেছে। প্রত্যাশা রয়েছে প্রতিষ্ঠানটি উচ্চশিক্ষার মান, পাঠক্রম ও গবেষণা পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের বিষয় যাচাই-বাছাই করার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যসূচি যাচাই-বাছাই করে র‌্যাংকিং নির্ধারণ করবে। শিক্ষার মান উন্নয়নে ওই প্রচেষ্টার ফল এখনো দৃশ্যমান নয়।

র‌্যাংকিং সম্পর্কে জনৈক শিক্ষাবিদ বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এই অবস্থার সবচেয়ে বড় কারণ হলো শিক্ষায় রাজনৈতিক প্রভাব। তার পর যে বিষয়গুলো উঠে এসেছেÑ তা হলো গবেষণা, অবকাঠামো, বাজেট, যোগ্য শিক্ষক, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত প্রভৃতি। মানের এই অবনমনের জন্য প্রধানত দায়ী শিক্ষকরা। দেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা বলে থাকেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সরকারি কর্তৃত্ব, শিক্ষকদের স্বায়ত্তশাসনের অপব্যবহার, শিক্ষায় বরাদ্দ এবং গবেষণার অপ্রতুলতা, শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অসঙ্গতি, শিক্ষার্থীদের আবাসন ও ছাত্র রাজনীতিতে সংকটজনক পরিস্থিতি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মুনাফামুখী প্রবণতার মতো বিষয়গুলো মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে চিন্তায় আনতে হবে। আবার এটি সত্য,

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কয়েকটির মান যথেষ্ট উন্নত। কিন্তু টিউশন ফি অত্যন্ত বেশি। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় মুনাফামুখী। ওই তুলনায় মান অর্জনে আগ্রহ কম। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় গবেষণার পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। আরও অভিযোগ হলো, শিক্ষকদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া হলেও এখন মূলত দলীয় রাজনীতি প্রধান হয়ে উঠেছে এবং সরকারদলীয় শিক্ষকদের দাপট বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে পড়েছে নির্বাচনকেন্দ্রিক। বছরজুড়ে শিক্ষকদের নানা নির্বাচন লেগেই থাকছে। শিক্ষক রাজনীতি যে কলুষিত হয়েছে, এটি মানতেই হবে। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের ছাত্রজীবনে ভালো ফলের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে দলীয় বিবেচনায় ‘ভোটার’ নিয়োগ দিয়েছিলেন। ফলে সেসব নি◌œমেধার শিক্ষকরা এখন অধ্যাপক পদে উন্নীত হয়ে দেশের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে প্রভাব বিস্তার করছেন। এতে নতুন চিন্তাভাবনা ও মুক্তবুদ্ধির প্রসারণের চেয়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হয়ে পড়েছে নির্বিকার সার্টিফিকেট বিতরণের জায়গা। অর্থাৎ অতীতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষা বা গবেষণার চেয়ে সরকারদলীয় আনুগত্য প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এতে শিক্ষকতার মান, শিক্ষার্থীদের সুযোগ ও গবেষণার মতো বিষয়গুলো বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। গত ১০ বছরে শেখ হাসিনার সরকারের নিরন্তর প্রচেষ্টায় উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়ন ঘটলেও পুরনো ভূত প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে দূর হয়নি। অথচ আমরা সবাই বলে থাকি, মানসম্পন্ন শিক্ষা ও উন্নত গবেষণা হচ্ছে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি। অবশ্য সবাই এক কথায় স্বীকার করবেন, শেখ হাসিনার সরকারের সময়োপযোগী শিক্ষানীতি ও এর সফল বাস্তবায়নের সুবাদে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বিপুল সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আমাদের গবেষণায় বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এখন শিক্ষার্থীরা বিশ্বের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাচ্ছেন। শুধু তা নয়, আমাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা বিশ্বের নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে গবেষণা করছেন। তাদের গবেষণা নন্দিত হচ্ছে। অনেকেরই গবেষণা ও প্রকাশনা আন্তর্জাতিক মানের। তারা মেধার ভিত্তিতেই সেখানে গেছেন। র‌্যাংকিংয়ে এই বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হলে এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান আরও উঁচুতেই থাকবে বলে আমরা মনে করি।

তিন.

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান নিয়ে কথা বলতে হলে বিশ্ববিদ্যালয় কী এবং এর কাজই বা কীÑ এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যার উদ্ভাবনা চলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন। এর গৌণ কাজ ওই বিদ্যাকে দান করা। বিদ্যার ক্ষেত্রে সেসব মনীষীর আহ্বান করতে হবেÑ যারা নিজের শক্তি ও সাধনা দিয়ে অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও সৃষ্টির কাজে নিবিষ্ট আছেন। মনীষীদের একক কিংবা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জ্ঞানের উৎস উৎসারিত হবে। শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ থাকতে হবে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্যই অর্থশাস্ত্র, কৃষিতত্ত্ব, স্বাস্থ্যবিদ্যা, সব ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে নিজের প্রতিষ্ঠানের চারদিকের নগর কিংবা পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে, নিজের আর্থিক সম্বললাভের জন্য সমবায় প্রণালি অবলম্বন করে ছাত্র-শিক্ষক ও চারদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হবে। আর এ রকম আদর্শ বিদ্যানিকেতনই হলো বিশ্ববিদ্যালয়। আসলে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ দেশের প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞান সৃষ্টি করা, জ্ঞান জগতের অভিনব উদ্ভাবনের নতুন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ও গবেষণায় শিক্ষার্থীদের নিয়ত নিয়োজিত রাখা।

চার.

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগতমান বজায়ের পূর্বশর্ত হলো, ইউজিসিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সবাইকে আন্তরিক ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে যোগত্যসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের দিকে জোর দিতেই হবে। চাকরির আবেদন করার যোগ্যতা হলেই চলবে না, বরং পাঠদানের যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কর্মকা- গবেষণাকেন্দ্রিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজের গুণগতমান বজায় রাখতে হবে। শিক্ষকের পাঠদান শিক্ষার্থীরা কতটুকু নিতে পারছে, সেদিকেও খেয়াল রাখা প্রয়োজন। অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান করাও জরুরি। উপরন্তু প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে হলে এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে হতে হবে মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং জ্ঞানসৃষ্টি ও প্রসারের কেন্দ্রস্থল। আমাদের দেশে অতীতে রাজনীতির নামে বিবদমান ছাত্র গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ ও রক্তপাতের কারণে সৃষ্ট নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমকে চরমভাবে বিঘিœত করেছে। তা অনভিপ্রেত। ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা করতে। দলীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করে তাদের মেধা, মনন বিকাশের দ্বার রুদ্ধ করা হয়। দলীয় লেজুড়বৃত্তি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম ব্যাহত করে একদিকে যেমন ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবন বিনষ্ট হচ্ছেÑ অন্যদিকে তেমনি সৎ, যোগ্য ও দক্ষ মানবসম্পদ এবং নেতৃত্ব গড়ে না ওঠার ফলে দেশ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতির নামে দলীয় লেজুড়বৃত্তি থাকবে না বলেই আমরা মনে করি। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস হবে সবার জন্য উন্মুক্ত। সেখানে সব দল ও মতাদর্শের সমন্বয় সাধন হবে। স্বাধীনভাবে সবার মতামত প্রকাশের অধিকার

থাকবে। ছাত্রছাত্রীরা হবে যুক্তিবাদী। উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরাই নিরেট সত্য প্রতিষ্ঠা করবে। তবেই শিক্ষাঙ্গন হয়ে উঠবে সঠিক জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রস্থল। বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে আধুনিক জ্ঞান অনুসন্ধান, জ্ঞানের চর্চা ও জ্ঞানের আদান-প্রদানের তীর্থস্থান। বিশ্ববিদ্যালয়ে একজনের মতাদর্শ আরেকজনের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। অযথা জোর করে কাউকে দলীয় লেজুড়বৃত্তিতে অংশগ্রহণে বাধ্য করারও অবকাশ নেই। তবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিপীড়ন-বৈষম্যের বিরুদ্ধে ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করা শিক্ষকদের অবশ্য কর্তব্য। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রথম শ্রেণির অন্যান্য সরকারি চাকরির তুলনায় অনেক কম সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এদিকেও মনোযোগ দিতে হবে সরকারকেই। এ ছাড়া ক্যাম্পাসে শিক্ষক রাজনীতির দলাদলি ও নিম্নমেধার শিক্ষকদের অপতৎপরতা বন্ধ করা গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নত হবে।

ড. মিল্টন বিশ্বাস : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ এবং পরিচালক, জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়